ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-৬

প্রাণিবিজ্ঞান

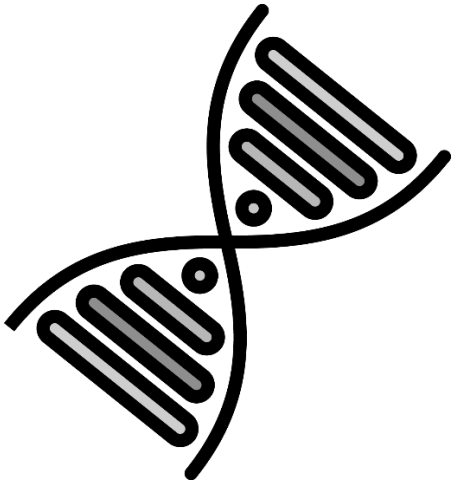

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-৬

প্রাণিবিজ্ঞান

সম্পাদনা ও সংকলন
সমীর কান্তি নাথ
জয়দীপ দে

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-৬
প্রাণিবিজ্ঞান
সম্পাদনা ও সংকলন : সমীর কান্তি নাথ ও জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Pranibiggan edited by Samir Kanti Nath & Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 1205 Second Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95631-9-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মধুসূদন গুপ্ত

প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে ভারতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রসারে
যিনি সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা

১. উদ্ভিদবিজ্ঞান
২. প্রাচীন পৃথিবী
৩. মহাবিশ্ব
৪. মানবদেহ
৫. গণিত
৬. প্রাণিবিজ্ঞান
৭. মানববিজ্ঞান
৮. পৃথিবীর কথা
৯. ভৌতবিজ্ঞান
১০. মনোবিজ্ঞান

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
জীবনের জন্ম ১১
প্রোটোজোয়ার সন্ধানে ১৬
প্রবালদ্বীপের প্রবালেরা ২১
মশারা যেভাবে বাড়ে ৩১
মৌমাছির সংগ্রাম ৩৫
পিঁপড়ের গল্প ৪২
মেরুদণ্ডীদের বদলে যাওয়ার কথা ৪৮
পশুপাখিদের লুকোচুরি ৫৭
পাখিদের দেশান্তর ৬৩
প্রাণিজগতে যুদ্ধবিগ্রহ ৭৪
প্রাণীদের শীতঘুম ৮৩
মেন্ডেলের মতবাদ ৮৯

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অগ্রদূত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলতেন, *যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা উৎসাহিত করার লক্ষে ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিষদের পক্ষ থেকে সে বছরই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর নেপথ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি তখন দুই বাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখনও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এ পত্রিকায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়বস্তুগুলো রুচিশীল ভাষা ও সাবলীল বর্ণনায় উপস্থাপন করা হতো। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিনির্মাণে এই পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে ধ্রুপদী কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়। সেসব প্রবন্ধ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবারের প্রবন্ধমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কিত ১২টি প্রবন্ধ। এর আগে বলে নেয়া দরকার কেন এমন একটি কাজে হাত দেয়া। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মোবাইলফোন বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে শিশুকাল থেকে সহজলভ্য। এর বাইরে আছে নানা ধরনের ভিডিও গেম।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানবিষয়ক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সহজবোধ্য মৌলিক বিজ্ঞানের বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার যে বইগুলো সচরাচর পাওয়া যায় তার বর্ণনা ও উপস্থাপনা উপভোগ্য নয়। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা সেসব বই পড়ায় আগ্রহী হয় না। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের প্রতি জানার সহজাত আগ্রহ রয়েছে। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা যায়।

এ পর্বে প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিশু-কিশোররা প্রাণিজগতের নানা বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন : পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আগমন; আদিপ্রাণী বা প্রোটোজোয়ার সরল দৈহিক গঠন, অথচ বিচিত্র জীবনপ্রণালি; বিভিন্ন পর্বের আগ্রহ-উদ্দীপক প্রাণী—প্রবালকীট, মশা, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদির জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে মেন্ডেলের মতবাদ সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। যা পড়ে শিশু-কিশোররা জীবজগতে প্রাণীদের টিকে থাকার লড়াই ও তাদের রহস্যময় জীবন সম্পর্কে ধারণা পাবে। পাশাপাশি প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ছবি ও ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনামে সামান্য পরিমার্জন আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা সংযুক্ত হয়েছে।

মূলত শিশু-কিশোরদের মৌলিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজ বা প্রবন্ধমালা প্রকাশ। শিশু-কিশোররা এতে যদি সামান্য উপকৃত হয় তাতেই এ আয়োজন সার্থক।

জীবনের জন্ম
বারীন্দ্র বসু

সুন্দর পৃথিবী, সৃষ্টির অপূর্ব সংগীতে ভরা। জড় ও জীবের মিলনে, চেতন ও অচেতনের পাশাপাশি সমাবেশে আরও সুন্দর। কিন্তু এই যে জীব, পৃথিবীতে তা এলো কী করে? জীব জগতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত মানুষ, বুদ্ধির জোরে আজ পৃথিবী যার হাতের মুঠোয়—এত শক্তি সে কোথায় পেল?

জীবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এমন একটা শক্তির বা এমন একটা কিছুর, যার সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই যে একটা কিছু, এইটাই কি জীবন? কোথা থেকে এটা এলো, কেমন করেই-বা এর উৎপত্তি হলো? বহুদিনের এই প্রশ্ন—কিন্তু সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

প্রাণিজগতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত—মানুষ। অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হলো মানুষের। যদি পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে হয় তবে মানুষ থেকে আরম্ভ করে উলটোদিকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। যেতে হবে জীব-বিবর্তনের প্রথম অধ্যায়ে।

তার আগে বলা প্রয়োজন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা বলেন, Omni vivum ex vivo, অর্থাৎ জীবন থেকে সৃষ্টি হয় জীবনের। অন্য কিছু থেকে তা আসতে পারে না। আজকের দিনে হয়তো তা সত্য, নতুন করে হয়তো কোনো জীবনের আর সৃষ্টি হচ্ছে না অন্য কিছু থেকে। কিন্তু যে জ্বলন্ত নীহারিকা থেকে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি, তার প্রচণ্ড উত্তাপে কোথায় ছিল জীবনের বাঁচার মতো আবহাওয়া? আর এই নীহারিকার চারপাশে যে আকাশ তা এত ঠাণ্ডা ছিল যে সেখানেও জীবন বাঁচতে পারে না। তবে কোথায়, কেমন করে ছিল জীবন, যা থেকে সৃষ্টি হলো অন্যান্য সব জীবনের?

জড় ও জীবের মধ্যে আসল পার্থক্য যে কোথায় তা নির্ণয় করা কঠিন। নির্দিষ্ট করে ঠিক এমন একটা রেখা টানা যায় না, যার এক পাশে থাকবে জড় ও অপর পাশে থাকবে জীব। সাধারণত যে সমস্ত গুণাবলি দিয়ে আমরা

জড় ও জীবের পার্থক্য নির্দেশ করি; যেমন—বৃদ্ধি, গতি, বাইরের আঘাতে সাড়া ইত্যাদি, এসব বিশেষ বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে জড় ও জীব উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। একমাত্র যে গুণ দিয়ে জড়কে জীব থেকে পৃথক করা যায়, তা হচ্ছে, জীব আপনা থেকেই নিজের মতো জীব উৎপাদন করতে পারে, অর্থাৎ বংশবিস্তার করতে পারে, কিন্তু জড় তা পারে না। জীবের সজীব কোষঝিল্লি আছে, জড়ের তা থাকে না। এই গুণের ওপর নির্ভর করেই আমাদের প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে হবে। এর সঙ্গে আর একটা কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো জড়পদার্থকে কেলাসিত করা যায়, যা কোনোক্রমেই জীবের দ্বারা সম্ভব নয়।

জীব-বিবর্তনের উচ্চতম প্রাণী থেকে যদি আমরা নিম্নতম প্রাণীর দিকে যাত্রা করি তবে দেখা যাবে, প্রাণিদেহের জটিলতা ক্রমশ কমে আসছে। প্রথমে মেরুদণ্ডী ও পরে অমেরুদণ্ডী স্তর অতিক্রম করে, প্রথমে দেহগহ্বরবিশিষ্ট ও পরে দেহগহ্বরহীন প্রাণিদেহ অতিক্রম করে, প্রথমে বহুকোষী ও পরে এককোষীতে এসে আমরা থামব। সবচেয়ে নিম্নতম এককোষী যে প্রাণীর আমরা দেখা পাব, তার দেহে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। এদের বলা যেতে পারে, আদিপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া। এদের শরীর খানিকটা জেলির মতো পদার্থ দিয়ে গঠিত, যাকে বলা যেতে পারে প্রাণপঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম। এর এক স্থানে যা খানিকটা জমাট বেধে গেছে তাকে বলা হয় কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস। এইটুকু সম্বল নিয়েই সে জীবন্ত জীবের সমস্ত গুণাবলি নিয়ে বেঁচে আছে; অর্থাৎ বলা যেতে পারে, একবিন্দু জেলিই জীবনযুক্ত হয়েছে। কোথা থেকে এলো এই জীবন? দেখা গেছে, নিউক্লিয়াস ও প্রোটোপ্লাজমকে আলাদা করলে কেউ আর জীবনযুক্ত থাকে না। কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস তো জৈবপদার্থ মাত্র, যার বিশ্লেষণ দ্বারা একই প্রকারের কতগুলো মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তবে জীবন কি ঐ বিশেষ প্রকার মৌলিক পদার্থের এক বিশেষ রূপান্তর?

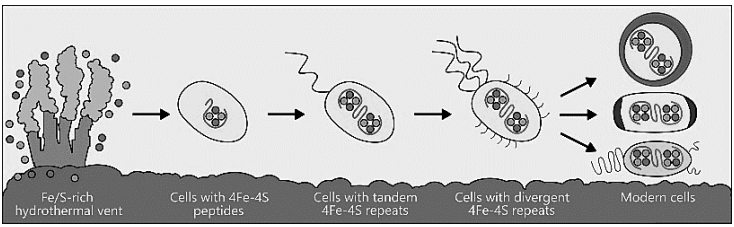

ছবি : প্রাণের ক্রমবিবর্তন

এখানেই না থেমে যদি আরও অগ্রসর হই তাহলে আমরা এখনও এমন জীবের দেখা পাব যারা গঠন ও প্রকৃতিতে সহজতর। ক্রমানুসারে আমরা পরপর সাক্ষাৎ পাব মোল্ডস, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস প্রভৃতির। আশ্চর্য রকম সহজ এদের গঠনপ্রণালি! আদিপ্রাণী বা প্রোটোজোয়ার শরীরে যা আছে তা থেকেও অনেক কিছু বাদ দিতে দিতে এদের ক্রমনিম্ন প্রকাশ। যে কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস ছাড়া প্রোটোজোয়ার বা জীবন্ত কোনো কোষের বাঁচা সম্ভব নয়। ব্যাকটেরিয়ায় এসে সেই নিউক্লিয়াসের সাক্ষাৎই সব পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও তারা জীবন্ত, কারণ তারা বংশবিস্তারে সক্ষম।

সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে ভাইরাসের বেলায়। এখানে এসে বিজ্ঞান শেষতম জীবের সাক্ষাৎ এই পেল। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, এরা ঠিক জীব কিনা। জড় ও জীবের উভয় ধরনের গুণ এদের মধ্যে বর্তমান। অতি ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা নেই, এমনকি, নেই প্রোটোপ্লাজমও! কারণ সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের দেখা তো মিলেই না, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখাও কষ্টসাধ্য, $\frac{1}{4000000}$ মিলিমিটারের চেয়েও ক্ষুদ্রকায়। সুতরাং অতি সরলতম গঠনবিশিষ্ট, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই ভাইরাস জড়, না জীব? বংশবৃদ্ধি বা নিজের থেকে নিজেরই মতো পদার্থ সৃষ্টিতে এরা সক্ষম, যা কোনোক্রমেই জড়ের দ্বারা সম্ভব নয় এবং যা একমাত্র জীবের দ্বারাই সম্ভব। তবে তো এরা জীবই! কিন্তু তাই-বা কী করে হয়? স্ফটিকীকরণ, যা একমাত্র জড়পদার্থেই সম্ভব, তাও তো এরা করতে পারে! তবে কি এরা জড়পদার্থ? আরও আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে—ভাইরাসের মতো কেলাসিত করা যায় এমন গুণবিশিষ্ট পদার্থ আমরা পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। তাহলে ভাইরাস জড় না জীব?

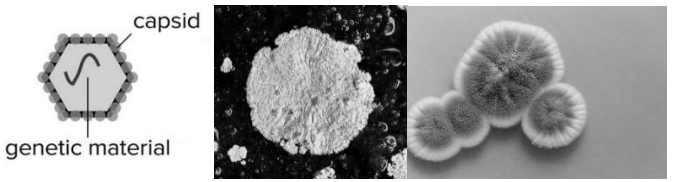

ছবি : ভাইরাস (বামে), অ্যাক্টিনোমাইসেটিস, মোল্ডস (ডানে)

বলা যেতে পারে—ভাইরাস জড়ও নয়, জীবও নয়। জড় ও জীবের মাঝের সেতু এই ভাইরাস। আমাদের সব থেকে কঠিনতম প্রশ্নের উত্তর হয়তো-বা এরই মাঝে লুকিয়ে আছে। বিবর্তনের ভিতর দিয়েই হয়তো ভাইরাস অন্যান্য জীবে বিবর্তিত হয়েছে।

ছবি : সাধারণ অণুবীক্ষণ (বামে) ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

এখানে আর একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের আণবিক গঠন অনুসারে প্রত্যেক পদার্থের অণুর কেন্দ্রে থাকে কয়েকটি পজিটিভ চার্জযুক্ত কণা অর্থাৎ প্রোটন সমন্বিত একটি নিউক্লিয়াস। একে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কয়েকটি বর্তনীর ওপর ঘুরতে থাকে সমসংখ্যক ঋণতড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট হয়, মৌলিক পদার্থটি কী হবে; অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের মৌলিক গুণাবলি নির্ভর করে এই প্রোটনের সংখ্যার ওপর। এই প্রোটনের সংখ্যা যদি কোনোক্রমে বাড়ানো বা কমানো যায় তাহলে একটি মৌলিক পদার্থ অন্য একটি মৌলিক পদার্থে পরিণত হবে। আর নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে পদার্থের রাসায়নিক গুণাগুণ।

কার্বন এক অদ্ভুত পদার্থ। কার্বনের মধ্যে কয়েক প্রকার বিপরীতধর্মী গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছে (কার্বন, ধাতু এবং যা ধাতু নয়, এ দুয়ের মাঝের এক অবস্থাবিশেষ)। এর সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে—সবচেয়ে বেশিসংখ্যক পরমাণুকে একত্রীভূত করে বৃহত্তম অণু গঠন করা, জৈবপদার্থের গঠনে যা একান্তভাবে প্রয়োজন। কার্বনের এই গুণ নির্ভর করে তার ইলেকট্রনের সংখ্যার ওপর। নাইট্রোজেন ও বোরনের এই গুণ নেই এবং এই বিশেষ গুণের ওপরই নির্ভর করে জৈবপদার্থের বিশেষ গুণাবলি। তাই কার্বনকে বলা যেতে পারে সমস্ত জৈবপদার্থের মূল। কার্বন ছাড়া কোনো জৈবপদার্থ থাকতেই পারে না।

ইলেকট্রন বিন্যাসের পার্থক্যে কার্বন যেমন জৈব গুণবিশিষ্ট হয়, তেমনি হয়তো কার্বনের মধ্যে অবস্থিত মূল পদার্থের নানা প্রকার বিন্যাস সমাবেশের ফলে তার মধ্যে এমন একটা শক্তির সৃষ্টি হয়েছে যাকে আমরা বলি জীবন। প্রাকৃতিক কোনো অবস্থাবিশেষের চাপে কার্বন সেই বিশেষ প্রকার জীবনবাহী ক্ষমতা বহন করে চলেছে। এই কার্বনই হয়তো শেষতম জড়পদার্থ, পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যা জড় ও জীবের মাঝের সেতু হিসেবে ভাইরাসে পরিণত হয়েছে।

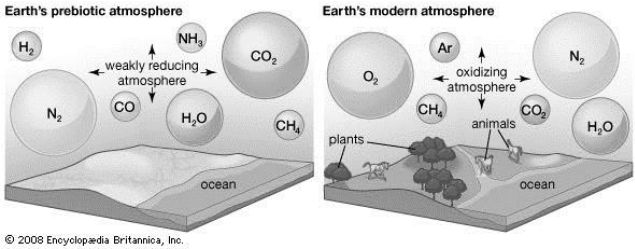

ছবি : পৃথিবীর আদি ও বর্তমান বায়ুমণ্ডলের তুলনা

তাহলে কি জীবনের উৎপত্তি জড় থেকে? কিছুই বলার উপায় নেই। হয়তো বিশ্বের সৃষ্টিকালে প্রোটনিক বিবর্তনে জড় ক্রমশ জীবে পরিণত হয়েছে। অথবা হঠাৎ দৈব দুর্ঘটনায় জীবনে পরিণত হয়ে গেছে। তারপর যত জীব সৃষ্টি হচ্ছে, তারা হয়তো সেই আদিমতম জীবের বংশধর। বর্তমানে আর নতুন করে জীবন সৃষ্টির কথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না।

অতএব 'Omni vivum ex vivo' যে সত্যিই তা জোর করে বলা যায় না। সত্যিই জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি কিনা, ভবিষ্যতে এর সঠিক উত্তর হয়তো-বা মিলতে পারে।

প্রোটোজোয়ার সন্ধানে

প্রায় তিনশ বছরেরও আগে নিজের কৌতূহল মিটানোর জন্য অ্যানটনি ভ্যান লিউয়েনহুক এক অপূর্ব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। নিজের হাতে কাচের টুকরা ঘষে ঘষে লেন্স তৈরি করে তার সাহায্যে তিনি একশ থেকে দেড়শ গুণ পরিবর্ধন শক্তিবিশিষ্ট মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেন। অবশ্য এর পূর্বে, প্রায় ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে জ্যাসেন ব্রাদার্স সাদাসিদা রকমের প্রথম মাইক্রোস্কোপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু লিউয়েনহুকের যন্ত্র জ্যাসেনের যন্ত্রের চেয়ে উন্নত হলেও লিউয়েনহুকের আসল কৃতিত্ব হলো—সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক অদৃশ্য জীবজগতের অস্তিত্বের রহস্য আবিষ্কারে। কারণ এর পূর্বে কেউ জানত না যে, এক ফোঁটা জলের মধ্যে এমন শত শত সূক্ষ্ম প্রাণী বিচরণ করে যাদের কেবল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে। না জানার কারণ—এক ফোঁটা অপরিষ্কার পানি কেউ কখনো মাইক্রোস্কোপের তলায় পরীক্ষা করে দেখেনি। এই অদ্ভুত অদৃশ্য জীবজগৎ সর্বপ্রথম লিউয়েনহুকেরই নজরে পড়ে।

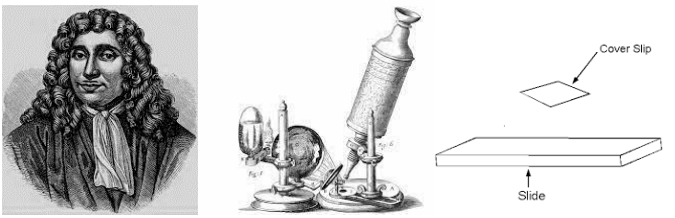

ছবি : লিউয়েনহুক ও তাঁর উদ্ভাবিত মাইক্রোস্কোপ (মাঝে) এবং স্লাইড ও কভারস্লিপ

লিউয়েনহুক প্রথমে যেসব প্রোটোজোয়া দেখেছিলেন তোমরা যদি সেগুলোকে দেখতে চাও তবে পুকুর থেকে এক গ্লাস ময়লা পানি এনে রেখে দাও। যেসব পুকুরের জলে লাল, নীল বা সবুজ সরের মতো পদার্থ দেখা যায় সেসব পুকুরের পানি হলেই ভালো হয়। অথবা আর একটা কাজও